শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর একজন সন্তানের লিখিত ডায়েরী

তোরাবোরা থেকে অ্যাবোটাবাদ

মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত

بسم الله الرحمٰن الرحيم

তোরাবোরা থেকে অ্যাবোটাবাদ

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহ. এর একজন সন্তানের লিখিত ডায়েরী

সম্পাদনা

মুস্তফা হামিদ আবুল ওয়ালিদ আল মিসরী

মাওলানা হামিদুর রহমান অনূদিত

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে আমার একটু আগ্রহ বেশি। জঙ্গিবাদ নিয়ে আমি আলহামদু লিল্লাহ প্রচুর পড়াশোনা করেছি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি যুদ্ধবিগ্রহের নেপথ্য কারণ। কেউ কেউ হয়তো অনেক বিষয়ে আপত্তি করবেন, তবে আমি মনে করি জানাশোনার অধিকার সবার আছে। বিশেষত এক্ষেত্রে আমি পাকিস্তানের সাংবাদিক সাইয়েদ সালিম শেহযাদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তিনি জঙ্গিবাদ বিশেষ করে আল কায়েদা সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন, যার কারণে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাঁকে গুপ্তহত্যা করে।

আমার একজন নিকটতম বন্ধু জানেন যে আমি এই বিষয়ে পড়াশোনা করেছি, তাই "মিন তোরাবোরা ইলা আবুতাবাদ" নামক একটি দুর্লভ পুস্তিকার অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমি আসলে একটু উদারবাদী মানুষ। আমি মনে করি পৃথিবীর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে মানুষ জানার অধিকার রাখে। তাই বইটির পিডিএফ প্রকাশ করছি।

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখতে চাই- আমার ব্যক্তিগত অধ্যায়ন হিসেবে বইটির মূল বর্ণনাকারী হিসেবে উসামা বিন লাদেনের ছেলে হামজা বিন লাদেনকে মনে হয়েছে, যদিও মিসরীয় সম্পাদক মুস্তাফা হামেদ আবুল ওয়ালিদ আল মিসরী কারো নাম উল্লেখ করেন নি।

এবং বইটির ভাষায় বর্ণনাকারীর মূলভাব ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন সন্তান যেভাবে তাঁর বাবাকে সম্ভধোন করে থাকেন, এখানেও তেমনই পাবেন। যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, বাকিটা সম্মানিত পাঠকের উপর বিচারের ভার থাকলো। ইতিহাসের একটি সম্পদ হিসেবে এই ছোট্ট পুস্তিকাটি সংরক্ষিত থাকুক, আল্লাহ তাআলার কাছে এমনটাই দুয়া করি।

টীকা লেখকের ভুমিকা:

এই ঘটনাগুলো এমন একজন লিখেছেন, যিনি ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট, এমন কেউ লেখেননি, যিনি কারো থেকে তা শ্রবণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন শাইখ ওসামা বিন লাদেনের রহঃ এক সন্তান। যারা আফগানিস্তানের ভেতর শাইখের সর্বশেষ সফরে তার সঙ্গে ছিলেন। যা ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে নিয়ে ২০০২ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এবং এই পুরো সফরই সম্পন্ন হয়েছিল ওপর থেকে মার্কিন বিমান বাহিনীর তীব্র গোলা বর্ষণ ও নীচ থেকে মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের মধ্য দিয়ে। প্রথমে আফগানিস্তানের কোনাড় প্রদেশে পৌছার নিয়তে কাবুল থেকে তোরাবোরা পর্বত পর্যন্ত, অতঃপর পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চল এবং পরিশেষে পেশোয়ার শহর।

আমি যখন আমার পক্ষ থেকে মন্তব্য বা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এবং কথার প্রসঙ্গে কিছু বলতে চেয়েছি, তখন তা বৃহৎ বন্ধনীর মাঝে লেখে দিয়েছি। সেখানে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী সে যুদ্ধের ঘটনাবলীর ডায়েরী নিরীক্ষণ করে ঘটনাগুলোর তারিখ যুক্ত করে দিয়েছি।

এছাড়া বাকি সকল লেখা সেই বর্ণনাকারীর, যিনি তাঁর বাবা উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সাথে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পৌছার আগ পর্যন্ত এই ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে তারা উভয়ে ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা উভয়েই নির্মম রক্তচোষা পশ্চাদ্ধাবন থেকে পলায়ন ও আত্মগোপনের বিভিন্ন প্রবাহে আলাদাভাবে পথচলা শুরু করেন। আর বিশেষ বাহিনী তথা মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের হাতে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর গুপ্তহত্যার ঘটনা-পরিস্থিতি তিনি তার পরিবারের স্বয়ং সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ আস্বাদনকারী সদস্যদের থেকে যেমন শুনেছেন, তেমনই বর্ণনা করেছেন।

বিন লাদেন ও প্রসিদ্ধ আফগান নেতা হেকমতিয়ারের[1] মধ্যকার সাক্ষাতের বিশেষ অংশটি এই পরিমান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, তাকে কেউ ভুলেও জটিল ও রহস্যপূর্ণ লোক বলে মনে করেনি। সকলেরই জানা যে, যেই নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের সময়ে অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও কঠোর বলে খ্যাতি লাভ করেছিল, বর্তমানে সে কাবুল সরকারের অধীনে দখলদার আমেরিকার

[1] গুলবুদ্দীন হেকমতইয়ার আফগানিস্তানের সোভিয়েত প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হিজবে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা। ২৬ শে জুন ১৯৪৭ সালে তিনি কুন্দুজে জন্ম গ্রহণ করেন। হেকমতইয়ার কাবুল ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিয়ানিরিং এর ছাত্র ছিলেন। -বাংলা সম্পাদক

লোকদের সাথে গিয়ে যুক্ত হয়ে গেছে এবং মুজাহিদদেরকে আত্নসমর্পন করে "শান্তির" আড়ালে দখলদারিত্বের চাকরীতে যোগদান করার আহবান জানাচ্ছে।

কোনাড় প্রদেশে উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সাথে হেকমতিয়ারের এক ধরনের অবস্থান ও বর্তমানে কাবুলে দখলদারদের সাথে তার আরেক ধরনের অবস্থান আমাদের সামনে অনেক কিছু স্পষ্ট করে দিচ্ছে এবং আমাদেরকে তার কতক জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বের কারণ ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে; বরঞ্চ আমরা বুঝতে পারছি যে, সঙ্কটপূর্ণ মূহুর্তের সাক্ষাতে বিন লাদেনের সাথে তার কর্কশ ও সংশয়মূলক আচরণের উদ্দেশ্যও সেটাই, যা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর সংশয়কে জাগিয়ে তুলেছিল। ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনা দ্বারা এমনটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠছে।

আমরা এ সফরে উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর এমন এক সন্তানের নিকট মেহমান হয়েছি, যিনি শাইখের সাথে অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় সবচাইতে বেশি সামঞ্জস্য রাখেন। কেমন যেন তিনি তার পিতার একটি ক্ষুদ্রাকৃতি। এমনকি তার বলনে, চলনে, নীরবতা ও স্থিরতাতেও। যিনি ৯/১১ এর ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে কান্দাহার ত্যাগ করার পর থেকে নিয়ে পার্বত্য সীমান্ত পার হয়ে ২০০২ সালের বসন্তকালে পাকিস্তানে পৌছার আগ পর্যন্ত তার বাবার সাথে ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন সময়... বিভিন্ন জায়গায়... আমার সাথে বসে সে সকল দূর্বিসহ দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতেন, যা দ্বারা আমরা খুব সহজেই ব্যাকুল হয়ে ওঠতাম। নিচের এ কথাগুলোই তিনি বলেছিলেন...

-মুস্তফা হামিদ - আবুল ওয়ালিদ আল মিসরী

কাবুল থেকে তোরাবোরা

বাবা (উসামা বিন লাদেন) কান্দাহার ত্যাগ করার পর কাবুলের উত্তরে কালকান গ্রামের প্রথম মহল্লায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি সাধারণতঃ পশ্চাদ্বর্তী মহল্লার মেহমানখানায় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। এমনিভাবে কাবুল ও 'মিস ঈনাক' প্রশিক্ষণশিবির এর মাঝে বিরতির জন্য রাজধানীর দক্ষিণ পার্শ্বে লোগার প্রদেশের প্রান্তবর্তী স্থানগুলোতে স্থানান্তরিত করা হতো। এভাবেই কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়।

শত্রুসাক্ষাৎের আশঙ্কা রয়েছে এমন স্থানগুলোকে নিশ্চিত করণের তত্ত্বাবধানে তিনি জালালাবাদের পাশে তোরাবোরা পর্বতেও যেতেন।

কাবুল পতনের দিন (১১ নভেম্বর ২০০১) আমার বাবা সেখানেই ছিলেন। অতঃপর তিনি তার কতক বিশ্বস্ত বন্ধুকে মিলিত করার লক্ষ্যে রাজধানী ছেড়ে জালালাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। যেমন পুরাতন মাঠ পর্যায়ের কমান্ডারদের মধ্য থেকে 'কমান্ডার আউয়াল গুল' ও 'ডঃ আমিন' এবং আল কায়েদার মধ্য থেকে 'আবু ওমর আল মাগরিবী"', 'মুহাম্মাদ ফাহিম' ও 'হামজা আল গামিদী' ও আরও অনেকে ছিলেন।

জালালাবাদ পতনের দিন (৬ ডিসেম্বর ২০০১) আমরা শহর ছেড়ে তোরাবোরা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন আমরা বাসে চড়লাম এবং লাইট না জালিয়ে এক রাত চললাম। আর আমাদের ড্রাইভার ছিল সেই হামজা আল গামিদী। এদিকে মার্কিন বিমান বাহিনী তখন শহরে বোম্বিং করে যাচ্ছিল।

পর্বতের পাদদেশে বাস থামিয়ে পদব্রজে আমরা ওপরে চড়তে লাগলাম। তিন ঘন্টা চলার পর আমরা আরবদের প্রথম ঘাঁটিতে পৌছি। তারা ছিল একটি প্রহরারত গ্রুপ। তাদের সাথেই আমরা রাত্রিযাপন করলাম। সকালবেলা নাস্তা সারার পর আমরা সূর্যোদয় থেকে নিয়ে আছর পর্যন্ত ক্রমাগত পর্বতে আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা আরব যুবকদের আরেকটি ঘাটিতে পৌছি। সেখানে আমরা গাছের নীচে একটি পরিখাতে বিশ্রাম গ্রহণ করি এবং অনেক কষ্টে আলু ও চাউল দ্বারা তৈরীকৃত একপ্রকার খানা লাভ করি।

বাবা ক্রমাগতভাবে ওপরে আরোহণ করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এদিকে বরফ আমাদেরকে বেষ্টন করে নিচ্ছিল। একপর্যায়ে পাকিস্তান ঘেঁষা পার্বত্য অঞ্চলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমাদের অবস্থান এমন এক এলাকায় ছিল, যে এলাকা সীমান্তের দু'পাড়ে বসবাসরত ভিন্ন দুই উপজাতিকে

আলাদা করে দেয়। আর আমরা ছিলাম মধ্যখানে। সেই এলাকাটি মৌলবী ইউনুস খালেস গ্রুপের[2] শহীদ ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ সাহেবের অনুগামী ছিল। সেখানে আমরা এক সপ্তাহ বা তার চে' কম সময় অবস্থান করি।

বাবা চাচ্ছিলেন আমরা যেন কোন আফগানী রাহবার সাথে নিয়ে লাগাতার পর্বতে আরোহণ করতে থাকি। তাই আমরা মাঝে শুধু নামাজটুকু আদায় করে আসর থেকে ফজর পর্যন্ত প্রায় দশ ঘন্টা লাগাতার হাঁটলাম। এদিকে বাবার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য দুই উপজাতির একটির সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। আর তার সাথে ছিল প্রায় ত্রিশজনের মত যুবক। কাফেলার ভেতর ছিল ডঃ আইমান আয যাওয়াহিরী[3], সুলাইমান আবুল গাইস[4], আবু ওমর আল মাগরিবী ও হামজা আল গামিদী। আর তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমরা দু'জন ছিলাম। আমরা বাবার সঙ্গে থাকতাম ও বাবার সকল কাজে তাঁকে সাহায্য করতাম।

ফজরের আগে আমরা এক গ্রামে পৌছলাম এবং গ্রামবাসী আমাদের ব্যাপারে কিছু টের পাওয়ার আগেই সেখান থেকে আমরা বের হওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগলাম। কেননা সেক্ষেত্রে সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। পরিশেষে আমরা পর্বতে একটি নির্জন বাড়ীতে পৌছি এবং সেখানে আমরা যোহর পর্যন্ত ঘুমালাম। এই সুযোগে মেযবান আমাদের জন্য চমৎকার খানার আয়োজন করে ফেলেন।

মধ্যরাত্রিতে ঘরওয়ালা আমাদের জন্য একটি ট্রাক উপস্থিত করলেন, যেন তা আমাদেরকে তাদের এলাকার পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে বয়ে নিয়ে যায়। আমরা তখন খুব ক্লান্ত ছিলাম। পর্বতের উপর আমরা দুই কামরা বিশিষ্ট একটি বাড়ী পেলাম। যা ভেড়ার খোঁয়াড় হিসেবে ব্যাবহৃত হত, তাই আমরা তাকে বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ পেলাম। যুবকরা তাকে তাদের পুশতু ভাষায় 'বাইতুল কিক' অর্থাৎ 'বিষ্ঠার বাড়ী' বলে নাম রেখেছিল। (বাবার অজান্তে আমি তাঁর ছবি তুলতাম। আমার কাছে একটি ক্যামেরা ছিল, দীর্ঘসময় যাবৎ আমি তা আমার সঙ্গে রাখতাম)। এক কামরায় আমি আমার বাবার সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে ছিল ডঃ আইমান আয যাওয়াহিরী ও সুলাইমান আবুল গাইস। আমার

---

[2] শাইখ ইউনুস খালিস (জন্ম- ১৯১৯ মৃত্যু- ১৯ জুলাই ২০০৬) হচ্ছে বৈশ্বিক জিহাদের একজন গুরু। তিনি ও তাঁর দল 'হিজবে ইসলামী খালেস' আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী ও মার্কিন বিরোধী যুদ্ধে অন্যতম ভুমিকা পালন করেন। আল কায়েদার বড় বড় নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রশংসা করেছেন।

[3] বর্তমান আল কায়েদা প্রধান শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরি ১৯ জুন ১৯৫১ সালে মিসরের কায়রোর মাআদি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আল কায়েদাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া ও বর্তমান অবস্থানে নিয়ে আসার পিছনে তাঁর সবচে' বেশি অবদান আছে বলে মনে করা হয়।

[4] শাইখ সুলাইমান আবু গাইছ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে কুয়েতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আল জাজিরা চ্যানেলে আল কায়েদার মুখপাত্র হিসেবে সাক্ষাতকার দিয়েছেন।

সহোদর অন্য কামরায় বাকি যুবকদের সাথে ঘুমিয়েছিল। এ অবস্থায়ই আমরা এক সপ্তাহের কাছাকাছি ছিলাম এবং আমাদের সাথে কোন আফগানী ছিলনা।

ফজরের সময় আমাদের নিকট ডঃ আইমানের সহধর্মিণী ও তার সন্তানদের এবং মুহাম্মাদ সালাহ্ ও আব্দুল হাদী আল উরদুনী ভাইয়ের শাহাদাতবরণের সংবাদ পৌছে। বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা তোরাবোরা পর্বতে ফিরে যাবো এবং ডঃ আইমানের নিকট প্রস্তাব রাখলেন যে, তিনি তার পরিবারের ইন্তিকালের কারণে যে ধাক্কা খেয়েছেন সেজন্যে যেন তিনি এক দিনের জন্য বিরতি গ্রহণ করেন[5]। তার সাথে যুবকদের একটি দল রেখে যান এবং যুবকদের আরেক দল বাবার সাথে চলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমরা তোরাবোরা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আর এটা ছিল আমাদের জন্য একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা আমরা সিংহের মুখে ফিরে যাচ্ছিলাম।

পথিমধ্যে আমরা বিমান দ্বারা বোম্বিংয়ের শিকার হলাম। একটি বোমা আমাদের থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে এসে পড়লো। তখন বাবা স্বস্থানেই বসে গেলেন। তার সামনে আমি বসা ছিলাম। যুবকরা সে জাগায় ছড়িয়ে পড়ল। ধূম্রাচ্ছন্নতা থেমে গেলে আমরা ভাইদের প্রতিরক্ষা লাইন পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখি। একদিন বা দুইদিন পর আমরা সেখানে ডঃ আইমানের দেখা পাই।

১৭ই রমাদান (৬ই ডিসেম্বর) থেকে তোরাবোরা পর্বতের ওপর বিমান হামলা করা হতো গণহত্যামূলকভাবে। ইতিপূর্বে সেখানে গোলাবর্ষণ ঘনীভূতাকারে সব জায়গায় না করে বিক্ষিপ্তভাবে করা হতো। তখনকার সেই দীর্ঘদিনের বর্বরোচিত বিমান হামলা চালানো সত্ত্বেও তোড়াবোড়া পর্বতে আরব শুহাদাদের সংখ্যা দশেরও কম ছিল। অথচ সেখানে তাদের মোট সদস্য ছিল ৩১৩ জন।

আমরা তোরাবোরা'র শীর্ষ উঁচুর কাছাকাছি সেখানে ছিলাম, শত্রুপক্ষের জন্য যেখানে পৌছা সম্ভাবপর ছিল। পর্বতকে ঘিরে রেখেছিলেন স্থানীয় কমান্ডার 'যামান', 'হযরত আলী' ও 'কমান্ডার আউয়াল গুল'। আর বাবার যারা বন্ধু ছিলেন তারা গঠনগতভাবে কমান্ডার 'যামান' এর সাথে মিলে গিয়েছিলেন বাবার ধার্যকৃত শর্ত পূরণে। তা হচ্ছে, আমাদের নিকট 'মুহাম্মাদ ফাহিম' গোপন লিংকের মাধ্যমে শত্রুভাবাপন্ন বাহিনীর সংবাদ পাঠাবেন।

B52 ফাইটার আমাদের উপর দিনের বেলা ও F16 ফাইটার আমাদের উপর রাতের বেলা ক্রমাগতভাবে বোম্বিং করতে থাকতো। প্রথমটি আসতে যেতে পর্বতের উভয়পার্শ্বে বোম্বিং করতো। যুবকরা বোমা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এক পাশ থেকে আরেক পাশে দৌড়াদৌড়ি করতো।

---

[5] এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে ডাঃ আইমান শাইখ উসামা বিন লাদেনের স্মৃতিচারণমূলক সিরিজ 'আইয়ামুন মায়াল ইমাম' এও আলোচনা করেছেন।

উসামা বিন লাদেনের পরিখাতে একটি স্লাইড

আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে একটি পরিখা ছিল। যার প্রশস্ততা ছিল আনুমানিক ২×৩ মিটার। যা বাবা আবুল গাইস ও ডঃ আইমান সহকারে ব্যাবহার করতেন। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাকে সালাম জানানোর দাবিতে আমাদের নিকট এলাকার কয়েকজন লোক আসে। (কিন্তু তারা গোপনে একটি ইলেকট্রিক স্লাইড রেখে যায়, সে জায়গার প্রতি বিমানকে পথনির্দেশ করার জন্য)। তাদের চলে যাওয়ার পর বাবা চাইলেন যে, আমরা যেন এ জায়গা ছেড়ে দেই এবং এখান থেকে দূরে পর্বতের কোথাও আরোহণ করি। সেখানে গিয়ে তিনি ঘুমালেন। বিমান এসে আর কোন প্রকার দেরি করলো না; এসেই আমরা ইতিপূর্বে যে স্থান ছেড়ে এসেছি সেখানে গোলাবর্ষণ করে। তখন বাবা একজন লোক প্রেরণ করলেন বোম্বিংয়ের পরিণাম অনুসন্ধান করার জন্য। ফিরে এসে অনুসন্ধানকারী জানালো যে, বিমান এসে সাত টন ওজনের একটি বোমা ফেলে পর্বতে বিশালাকারের একটি গর্ত তৈরী করে ফেলেছে। আঘাতটি সরাসরি বাবার পরিখাতে এসে লাগে। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে ছিল।

(২৭ই রমাদান ১৬ই ডিসেম্বর) দু'দিন আগে রেডিও যোগে আমাদের নিকট আবু হাফস আল মিসরীর শাহাদাতবরণের সংবাদ পৌছে। সেদিন বাবা আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি এবং আমার ভাই যেন এ এলাকা ছেড়ে চলে যাই। আমি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি ও বলি যে, বরং আমার ভাই চলে যাক, আমি আপনার সাথে থাকবো। বাবা আমাকেও চলে যাওয়ার জন্য অনেক জোর দিলেন। অতঃপর তিনি অল্প সময়ের জন্য আমাদের ছেড়ে বাহিরে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, তোমরা তিনজনই চলে যাবে; তুমি, ডঃ আইমান ও আবুল গাইস। তখন আমরা এক অজানা পথের দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম এবং সেখানে বাবার অপেক্ষা করছিলাম।

আসরের সময় আমরা তিনজন একজন আফগানী রাহবারসহ এস্থান ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বাবা আমাকে বিদায় জানানোর জন্য এলেন। তখন তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও আমার কপালে চুমু খেলেন। এতে আমার মনে ধাক্কা লাগে। কেননা তিনি এতে অভ্যস্ত ছিলেন না। আর আমার ভাইদের মধ্যে একমাত্র আমিই সেই সন্তান, যার কপালে আমার বাবা চুমু খেয়েছেন। ভয়ের এই দিনগুলোতে আমিই ছিলাম তার নিজস্ব খাদেম, আমিই তার প্রয়োজন পূরণে তাকে দেখাশোনা করতাম।

তোরাবোরা পর্বত জালালাবাদের দিক দিয়ে অবরুদ্ধ ছিল। অন্ধকারের ভেতর আমরা পর্বতের আফগানী অংশের দিকে নেমে আসি, যা মন্ত্রী উপজাতিদের অধিনস্থ ছিল। এ উপজাতির কয়েকজন সদস্য আমাদেরকে পালিয়ে তাদের গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। গ্রাম অভিমুখী হয়ে

আমাদের নেমে আসার সময় আহমাদ শাহ্ মাসউদের লোকেরা আমাদেরকে প্রায় পেয়ে বসেছিল। তারা প্রহরার কাজে টহল দিচ্ছিল। তাদের গাড়ীর আলো আমাদের গায়ে এসে লাগার উপক্রম হয়। তখন আমরা দ্রুত মাটিতে শুয়ে পড়ি। পর্বতের উপরে থাকাবস্থা থেকেই আমার পা আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। পর্বতের ওপর থেকে আছড়ে পড়া পানির নালা পাড় হওয়ার সময় ডঃ আইমানের চশমা পড়ে যায়। কিন্তু অন্ধকারের কারণে আমাদের পক্ষে সেটার আর কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়না। পরিশেষে আমরা একটি গোপন বাড়ীতে পৌছি, যা প্রস্তুত করেছিল সেই উপজাতির লোকেরা। সেখানে আমরা একরাত ঘুমাই।

(১৭ই ডিসেম্বর) সকালবেলা তারা আমাদের জন্য একটি পিকআপের ব্যাবস্থা করে দিল। তা আমাদেরকে এবড়োথেবড়ো পথ দিয়ে জালালাবাদের পাশ দিয়ে নিয়ে যায়, অতঃপর সেখান থেকে সরাসরি কোনাড় প্রদেশের দিকে বাঁক ঘুরে। পরিশেষে আমরা কোনাড় প্রদেশের প্রধান নগরী (আসাদাবাদে) পৌছি। এবং সেখানে একটি গোপন বাড়ীতে আত্মগোপন করি।

(১৯ই ডিসেম্বর) ঈদুল ফিতরের দিন ফজরের একটু পূর্বে আমাদের নিকট একজন আফগানী যুবক এসে আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, উসামা বিন লাদেন এসেছেন। কয়েক সেকেন্ড পরই আমাদের নিকট বাবা প্রবেশ করলেন। আমরা শুকরিয়ার্থে আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং বাবাকে বললামঃ আমরা একই দিনে দুইটি ঈদ লাভ করেছি; ফিতরের ঈদ ও আমাদের নিকট আপনার নিরাপদে ফিরে আসার ঈদ।

যিনি আমাদের নিকট বাবাকে হাজির করলেন তিনি হলেন, 'উস্তাদ আউয়াল গুল'। যিনি নিজের (কালো ছায়াচ্ছন্ন সাদা ল্যান্ডক্রোজ) গাড়ীতে করে বাবাকে কোনাড় প্রদেশের সীমান্তে নিয়ে এসেছেন এবং সেখানে যুবকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। বাবা আমাদের সঙ্গে সেই গোপন বাড়ীতেই থেকে গেলেন। শীত আমাদের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছিল। এমনকি আমরা বরফকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আগুন প্রজ্জলিত করতে পারছিলাম না। কেননা সেক্ষেত্রে মানুষেরা এ বাড়িতে কারো বিদ্যমান থাকার কথা বুঝে ফেলবে।

হেকমতিয়ারের আগমন

খালেদ আশ্-শাইখ ও পাকিস্তানস্থ তার দলের সহায়তায় প্রায় তিনমাস পর ২০০২ সালের মার্চ মাসে আমাদের নিকট হেকমতিয়ারের আগমন ঘটে। খালেদ ছিলেন বাবা ও পাকিস্তানের যারা বাবার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের মধ্যকার সংযোগ মাধ্যম। হেকমতিয়ার একটি ভিন্ন বাড়িতে একাকী থাকার জন্য চলে যায়। সে আমাদের নিকট এলেও আমাদের থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাবা, ডঃ আইমান ও

আবুল গাইসের সাথে কথা বলতো। আমরা তাদের থেকে দুরত্ব বজায় রেখে বসতাম। তথাপি আমরা তাদের মাঝে টেনশন, উত্তেজনা ও টানাপড়েন উপলব্ধি করতাম। অতঃপর হেকমতিয়ার আবার আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার ভিন্ন বাড়িতে চলে যেত। তার সাথে কথা বলার জন্য বাবা আবুল গাইসকে পাঠাতেন। অতঃপর তিনি হেকমতিয়ারের অপ্রত্যাশিত কথা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসতেন। হেকমতিয়ার একবার আমাদের গোপন বাড়িতে আমাদের এক সাক্ষাৎে বাবার মুখের ওপর একটি বিস্ফোরণ ঘটায় এ কথা বলে যে, (এখানে আমির আমিই, তুমি নও... সুতরাং কান্দাহারে তুমি তোমাকে ভেবো না)।

হেকমতিয়ার নিয়মিতভাবে আমাদের গোপন বাড়ির আঙ্গিনায় আসতে শুরু করে, তারপর সে টেলিফোন যোগে কথা বলা শুরু করে। বাবা তাকে এসব করতে নিষেধ করেন, কেননা এটা তাদেরকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। কিন্তু হেকমতিয়ার অমান্য করে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

এই টানাপড়েন সম্পর্ক সত্ত্বেও হেকমতিয়ার একদিন একটি হাদিয়া নিয়ে আসে। আর তা হল, একটি ঘড়ি এনে সে কামরার মাঝখানে একটি টেবিলে রাখে। তখন বাবা বলে ওঠে, না.. না আমরা এটা চাইনা...। তখন হেকমতিয়ার ঘড়িটা ফিরিয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে আমাদের নিকট সে বারংবার আসা-যাওয়া করতে লাগে।

অতিশয় গুপ্ত

আমরা পর্বতে থাকাবস্থায় খালেদ আশ্-শাইখ আমাদের নিকট একটি কম্পিউটার ও উপরে 'অতিশয় গুপ্ত' লেখা একটি অন্তর্নির্মিত ডিস্ক প্রেরণ করে। বাবা বললেন, আজব জিনিস তো!! তোমরা দেখোনা, আমি একাই দেখছি। অতঃপর দেখা গেল যে, তা রিপোর্টার "ইউসরি ফাউদা" (Yosri Fouda) এর 'অতিশয় গুপ্ত' নামে একটি তথ্যসংক্রান্ত প্রোগ্রাম। ভিডিওটি আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম এবং প্রথমবারের মতো গোয়েন্তানামোর বন্দি ভাইদের চিত্র প্রত্যক্ষ করলাম।

বাবার নির্দেশে হামজা আল গামিদী আমাদের ছেড়ে চলে যান। আর বাবার সাথে আমি, আমার ভাই, আবুল গাইস, ডঃ আইমান ও আবু বাছির থেকে যাই। আমরা খানা পাকানো ও জীবিকা নির্বাহর দায়িত্ব বন্টন করে নিয়েছিলাম। আমার ভাইয়ের পালা এলে আমি এবং সে দু'জন মিলে অন্যদের একদিনের কাজ করতাম। আমাদের কেউ দেখে ফেলে না মতো দুটি পাত্রে করে পানি আনার জন্য উপত্যকায় নেমে আসতাম এবং উপরে আরোহণের সময় তীব্র শীতের রাত্রিতে তা আমাদের শরীরে গড়িয়ে পড়তো। আমাদের দৈনিক তিনবেলা খানা প্রস্তুত করা হতো। কোন একদিন আমরা ইফতারিতে মা'সুবা তৈরী করি। এটা একটি সৌদি খাবার। আর তা হল ময়দার কাই, যার মাঝে মধু ও ঘি থাকে। ডঃ আইমান তা খেতে অস্বীকৃতি জানান ও বলেন, এটা দেশীয় খাবার নয়। সকালবেলা

আমরা কয়েকটি লাউ ও আলু পাই। তা দ্বারা আমি স্যুপ তৈরী করেছিলাম, তাতে বাবা অনেক খুশি হয়েছিলেন। আমাদের সাথে যারা ছিল তারা সবাই চলে গেল এবং শুধুমাত্র আমরা তিনজন বাকি রয়ে গেলাম; আমি, বাবা ও ডঃ আইমান। বাবা আশঙ্কাবোধ করলেন যে, যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তাদের কেউ বন্দি হয়ে শত্রুদেরকে বাড়ির অবস্থান বলে দিবে। তাই আমরা আমাদের অবস্থান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সফর করি এবং অন্যান্য দলের নিকট আত্মগোপন করি। হেকমতিয়ার আমাদের সঙ্গে সবেমাত্র যুক্ত হল!! আর ওমনি বলে ওঠলো, বিমান এসে সেই এলাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে যেখানে তোমরা ছিলে!!

হেকমতিয়ার পর্বতের চূড়ায় আমাদের সামনা-সামনি একটি বাড়িতে থাকতো এবং মাঝে মাঝে আমাদের এখানেও আসতো। একদিন সকালে সে তার বাড়ি ছেড়ে পর্বত বেয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। একজন আফগানী আমাদেরকে জানাল যে, সে যেই পর্বতে থাকতো মার্কিনিরা সেই পর্বতে হামলা করেছে।

তিক্ত মধু

পর্বতের ওপর আমরা তিনজন এক কামড়াতে থাকতাম। একবার ডঃ আইমান ও বাবার মাঝে উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। হেতুটি ছিল এই যে, বাবা পাকিস্তানী কুলফলের মধু ক্রয় করলেন। তখন ডঃ আইমান ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "আমাদের জন্যে মুজাহিদদের টাকায় মধু ক্রয় করা জায়েয নেই"। তখন বাবা বললেন, আসুন... আল্লাহর দয়ায় জিহাদ শুরু হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি মুজাহিদদের একটি টাকাও নিজের ও নিজের সন্তানদের পিছনে খরচ করিনি। এই মধু আমি আমার ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছি। তখন ডঃ আইমান চুপ হয়ে গেলেন, বাবার কথায় আর কোন মন্তব্য করলেন না।

এ অবস্থায় আমরা কিছু সময় বসে রইলাম। সেদিনই আমাদের বাড়িতে একজন অপরিচিত ব্যক্তির আগমন ঘটে। সে সকলের নিকট পরিচয় দিচ্ছে যে, সে আবু আহমাদ আল কুওয়াইতী। এবং সে বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার অপেক্ষায় আমাদের বাড়ি থেকে একটু উপরের একটি বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। বাবা আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তার কাছে গিয়ে তার পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হই। আমি গিয়ে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই তিনি আবু আহমাদ। আমি বাবাকে সংবাদ দিলে বাবা তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত তার উপস্থিতি কামনা করলেন।

স্থায়ীত্বের স্বপ্ন বাষ্পে পরিণত হওয়া!

এতক্ষণে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যায় এবং মার্কিনিরা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আমরা আমাদের বর্তমান আশ্রয়স্থলেই থেকে যাব বলে বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সে এলাকাতেই ভবিষ্যৎকালীন স্থায়ীত্বের মতো করে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যেই আমাদের আফগানী মেযবানদের সহিত তিনি আলোচনা প্রস্তাবনা করে ফেলেন যে, তারা যেন আমাদের জন্য কোনাড় প্রদেশে একটি বাড়ি তৈরী করে দেন এবং তাদের সামনে তিনি বাড়ির একটি নকশাও তুলে ধরেন। এটাই সেই নকশা, যা পরবর্তীতে আবোটাবাদের বাড়ি তৈরীর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছিল। যেই ডিজাইনটি দৃষ্টিবিভ্রমের ওপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়েছিল।

অতঃপর তিনি তাদেরকে দখলদারদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এবং কার্যত পরবর্তীতে তারা মার্কিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা তাদেরকে ছেড়ে চলে আসবো এতে কোনক্রমেই তারা আগ্রহী ছিলো না। বাবা তাদেরকে টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করালে তখন তারা আমাদেরকে যাবার অনুমতি দেয়। বাবা তাদের হাতের ওপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, যখন আফগানিস্তান ও সৌদী আরব মুক্ত হবে তখন তিনি মক্কায় হেরেম শরিফের নিকটে তাদের জন্যে একটি বাড়ি তৈরী করে দিবেন।

এর কয়েকদিন পরই আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্তদের প্রধান “মুহাম্মাদ ফাহিম” আমাদের নিকট জালালাবাদ থেকে খবরাখবর নিয়ে আসেন। বাবা তাকে দখলদার বিরোধী যুদ্ধের তৎপরতায় অর্থায়ন করার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার প্রদান করেন ও তাঁর জন্য কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন। ইতিমধ্যে সেগুলোর কয়েকটি বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। বাবা সেগুলোর একটি শোনার সময়, -যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল- শুকরিয়ার্থে আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। এটি ছিল জালালাবাদে আরবদের প্রতি নির্যাতনের কিয়দংশের প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু এর কিছুকাল পর "ফাহিম" নিজেও শাহাদাত বরণ করেন।

মূহুর্তের ভেতর কোনাড় প্রদেশের পর্বতে আমাদের বাড়ি তৈরী করা ও তাতে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন বাষ্পে পরিণত হয়ে গেল, কেননা ইতিমধ্যেই আমাদের এলাকাতেও মার্কিনিরা পৌছে গেছে। আমাদের নিকট সতর্কসংকেত নিয়ে এসেছে এমন এক আফগানী, যিনি তার হাতে থাকা ওয়ার্লেসে নিন্দা জানাতে জানাতে বিস্ফোরিত নেত্রে আমাদের নিকট প্রবেশ করেছিলেন। লোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদেরকে সংবাদ দিল যে, আমরা পর্বতের নিম্নবর্তী যে সকল উপত্যকাগুলোতে আত্মগোপন করতাম, মার্কিনিরা সেখানে দিয়ে অতিক্রমণ করছে ও সেগুলোতে তারা তাদের সাজ-সরঞ্জামাদি নিয়ে অত্যন্ত তীব্রতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

অবস্থানটি ছিল প্রচন্ড সঙ্কটপূর্ণ!! আমরা সর্বোচ্চ গতিতে জুতা পরিধান করি ও অস্ত্র ধারণ করি এবং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে থাকি। এমনকি তুষার আর না থাকা সত্ত্বেও আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা আমেরিকার 'হামির' গাড়িগুলোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সেগুলো আমাদের নিম্নভাগের উপত্যকা দিয়ে অতিক্রমণ করছিল। গাড়ির বহর চলে যাওয়া আগ পর্যন্ত আমরা গাছের আড়ালে বসে থাকি। অতঃপর আবার ওপরে চড়া অব্যাহত রাখলাম। বাবা আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, শত্রুরা আমাদের দিকে ফায়ার করা ব্যতিত আমরা যেন তাদের দিকে ফায়ার না করি। তখন ডঃ আইমান বললেন, আমি কিছুতেই পূণরায় কারাবন্দী হবো না।

আমরা পর্বতের ভাঁজগুলো দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওপরে আরোহণ অব্যাহত রাখছিলাম। সে এলাকার বন্ধুরা আমাদের আত্মগোপন করার জন্য একটি জায়গা অনুসন্ধান করছিল। অতঃপর তারা একটি বিরাটকায় গাছ পেল। সেটিকে তারা ভূপৃষ্ঠের সাথে ধনুক বানিয়ে কাটলো। যেন শিকড় ও জমিন মিলে এমন একটি পরিখার আকার ধারণ করে, যার নীচে প্রলম্বিতভাবে একজন মানুষ শুতে পারে। বাবা ও ডঃ আইমান তাতে প্রবেশ করেন এবং তাদের পায়ের নীচে আমি শুয়ে পড়ি। আমাদের আফগানী সঙ্গীরা মার্কিনীদের প্রতারিত করার জন্য ঘাস দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে দেন। তখন কোন বিমান আসেনি ঠিকই; কিন্তু তাদের পদাতিক সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামাদি দ্বারা পুরা উপত্যকা ছেয়ে গিয়েছিল এবং তারা সরাসরি সেই পর্বতেরই নীচে অবস্থান করছিল, যে পর্বতে আমরা অবস্থান করছিলাম।

আমরা এইভাবে এই শিয়ালের গর্তে দুইদিন আত্মগোপন করে থাকি। ফজর থেকে মাগরিবের পর পর্যন্ত কোনরকম খানাপিনা ও প্রকৃতির ডাকে সাড়াদান ব্যতিত। (বাবার সেই ছদ্ম আবরণ দ্বারা গোপনকৃত গর্ত থেকে বের হওয়ার চিত্রটি আমি ভিডিও আকারে ধারণ করেছিলাম। ভিডিও ক্লিপটি مؤسسة السحاب للإعلام – আস সাহাব মিডিয়ার প্রকাশনাগুলোর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।)

পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর আফগানীরা আমাদেরকে সংবাদ দিলো যে, শত্রুরা চলে গেছে এবং এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে। আমরা পর্বত থেকে নীচে অবতরণ করা আরম্ভ করলাম এবং তা দিবসের প্রথম প্রহর থেকে নিয়ে প্রায় যোহর পর্যন্ত চলতে থাকে। (আমি বাবা ও ডঃ আইমানের সেই পর্বত থেকে নেমে আসার দৃশ্যটি ছবি তুলে রেখেছিলাম। যা বিশ্বব্যাপী তোরাবোরা পর্বতের নামে ছড়িয়ে পড়েছে)।

সেখান থেকে নেমেই আমরা দ্রুত সামনের পর্বতে চড়া শুরু করি, যার শেষ পাদদেশে পাকিস্তান অবস্থিত। এবং আমাদের ক্রমাগত আরোহণ ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পর্বতটির শৃঙ্গ অত্যন্ত সুউচ্চ ও ভয়ঙ্কর ছিল। কেননা তা এই পরিমাণ উঁচু ছিল যে, আরোহণকালে আমরা মেঘের ভেতর প্রবেশ

করে ফেলেছিলাম। ফলে আমাদের দাড়ি ও পোষাকগুলো ভিজে গিয়েছিলো। আমাদের সাথে তখন একজন বা দুইজন আফগানী ছিল এবং খাবার ছিল অত্যন্ত স্বল্প।

আমরা এমন একটি গ্রামের পার্শ্ব ঘেষে অতিক্রম করলাম, যা পর্বতের শেষ তৃতীয়াংশে অবস্থিত। আমরা সেটিকে এড়িয়ে চললাম ও আমাদের আরোহণ পর্বতের ঠিক চূড়ায় পৌছা পর্যন্ত অব্যাহত রইল। আমরা সকলেই ছিলাম ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাই বাবা বললেন, "আমরা কিছুটা বিশ্রাম নিব, তারপর সফর চালিয়ে যাব"। তাই আমরা গাছের নীচে একটি জায়গা ঠিক করলাম, যেন সেখানে আমরা টানটান হয়ে শুতে পারি। (এ সকল ঘটনার সবকিছুই আমার সাথে থাকা ক্যামেরায় রেকর্ডকৃত ছিল, বৃষ্টির সময় আমি তা আমার নীচে বা আমার জামার ভেতর লুকিয়ে রাখতাম)।

আমাদের বিশ্রাম শুরু করার দশমিনিট পর আমাদের ওপর মুষলধারে তীব্র বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। আমরা এই পরিমাণ ক্লান্ত ছিলাম যে, আমরা নিজেদের জায়গা থেকে উঠে দাড়াতে পারছিলাম না। ক্যামেরাটি আমি আমার নীচে লুকিয়ে নিলাম যেন তা নষ্ট না হয়। ফজরের সময় বৃষ্টি থেমে গেলে আমরা সূর্যোদয় পর্যন্ত সফর চালিয়ে যাই। আমাদের আফগানী সঙ্গীরা আমাদেরকে এ কথা বলে সান্তনা দিচ্ছিল যে, গন্তব্যস্থল সন্নিকটে।

পাকিস্তানের ধাপ

অতঃপর এখান থেকে তো সম্পূর্ণরূপে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। আমরা পর্বতের পাকিস্তান প্রান্তে অবস্থান করছিলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদেরকে ক্লান্ত বানিয়ে ফেলেছিল। তখন আমরা পর্বতের সঙ্কীর্ণ গিরিপথের পাশে একটি শিলাখন্ডের সন্ধান পাই। যা ধনুকাকৃতির এমন ছিল যে, সে তার অভ্যন্তরে পানি সংরক্ষণ করে রাখতো। ফলে আমরা তা পান করলাম এবং সফর চালিয়ে গেলাম।

আমাদের সফর পূর্ণ একদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর মাঝে আমরা আধঘণ্টার বেশী বিরতি দেইনি। যোহরের দিকে আমরা আত্মগোপন ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য একটি বাড়িতে উঠি। তারা আমাদেরকে এমন একটি কামড়ায় প্রবেশ করালো, যা বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। কামড়াটি সার্বক্ষণিকভাবে তাদের উৎকট গন্ধে পরিপূর্ণ থাকতো। সেখানে আমরা খালেদ আশ্ শাইখের (মুখতারের) অপেক্ষায় ছিলাম।

এ যাবৎ আমরা পর্বতের ওপরেই আছি, গাড়ির রাস্তায় পৌছতে আমাদের আরো আধঘণ্টা সময় লাগবে। আফগান সঙ্গীরা খুব টেনশন করছিলেন ও বলছিলেন যে, মার্কিনিরা পর্বতের নীচে অবস্থান করছে এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতক আফগানীরাও রয়েছে। আমরা আপনাদেরকে সতর্ক করছি যে,

আপনারা নীচে অবতরণ করবেন না। বাবা আমাকে রাস্তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য নামার নির্দেশ দিলেন। একজন আফগানী আমার সঙ্গে ছিল। এবং যদি কোন সমস্যা হয়ে যায় ও আমি যদি গ্রেফতার হয়ে যাই, তাহলে যেন আমি সংবাদ পাঠাতে পারি এজন্য আমাকে একটি সম্মতিপূর্ণ সঙ্কেত দিয়ে পাঠালেন।

আমি নীচে নামলাম; কিন্তু তাদের কথানুযায়ী কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন বাবা ও ডঃ আইমান পর্বতের ওপর থেকে নেমে এলেন। এখানে মুখতার আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি "পাজারু" গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা দিনের বেলায়ই পেশোয়ার শহরে প্রবেশ করি এবং একটি বাড়িতে আমার বিমাতা ও আমার সৎ বোন পৌছার আগপর্যন্ত একদিন বা দুইদিন অবস্থান করি। সেই সঙ্কটপূর্ণ সফর শেষে বাবা আমার নিকট এলেন ও বললেন, "এখন তোমার বিবাহের সময় হয়েছে, প্রস্তুতি নাও!"। আমি অসম্মতি জানালে তিনি সুদানি ভাষায় আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "ইয়া জাওল... ইয়া জাওল... দায়িরিনা নাশুফু আওলাকা ইয়া জাওল!"। অর্থাৎ "হায়রে আশ্চর্য! হায়রে আশ্চর্য! আমরা এখন তোমার সন্তাদের দেখে যেতে চাই! বুঝলে!"

তখন আমি সম্মতি দিলাম। অতঃপর আমার সঙ্গ দেওয়ার জন্য যুবকরা এসে উপস্থিত হলো এবং বাবা আমার হাতে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে বললেন, "এই নাও! বিবাহের কার্যাদিতে এর দ্বারা সহায়তা নাও!"। বাবাকে ছেড়ে আমি অন্যত্র সফর শুরু করি। ইতিপূর্বেই বাবা নিরাপত্তার স্বার্থে ডঃ আইমান থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দলে বিভক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মুস্তফা হামিদের কথা ও ডায়েরির সর্বশেষ পাতা!

মুস্তফা হামিদঃ যুবক তার বাবা ওসামা বিন লাদেনকে ছেড়ে আসার পর নিজের ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। প্রথমে তিনি সফর শুরু করেন পেশোয়ার থেকে লাহোর, অত:পর রাওয়ালপিন্ডি, অতঃপর করাচী, অতপর কোয়েটা... এবং সর্বশেষ ইরান... যেখানে গ্রেফতার, কারাগার এবং বহু রুক্ষ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। পরিশেষে আমাদের নিয়ে পূনরায় তার বাবার ওখানে আবোটাবাদে ফিরে আসেন এবং আমেরিকা সেখানে যে সকল দুষ্কর্ম সাধন করেছে সেগুলো বর্ণনা করেন। আর এগুলো তিনি পরিবারের সেই কষ্ট ভোগকারী সদস্যদের নিকট থেকে যেভাবে শুনেছেন সেভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইনি আল্লাহর বান্দা: আবোটাবাদ... সফরের শেষ প্রান্ত!

(২০১১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় ভোর) সে রাত্রিতে বাবা উসামা বিন লাদেন সেই বাড়ির তৃতীয় তলায় অবস্থান করছিলেন, যা একটি বাগানসহ তিনতলা বিশিষ্ট করে তৈরী করা হয়েছিল। যে বাগানের ভেতর পাহারাদারের জন্য একটি ঘর ছিল।

ফজরের পূর্বে বাবা নীচতলা থেকে ভেসে আসা একটি অপরিচিত শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তার ছেলে খালিদকে নীচে নেমে বিষয়টি উদ্ঘাটন করার জন্য বললেন। কিন্তু খালেদ উপরে তার নিকট আর ফিরে আসেনি।

যে আওয়াজটি বিন লাদেনকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল তা ছিল সে বাড়িতে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের আক্রমণের আওয়াজ। তারা অবতরণের কাজটি সম্পন্ন করেছিল দুটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে। সৈন্যরা বাড়ির ওপর ও নীচ উভয় দিক থেকে হামলা করেছিল। হেলিকপ্টারটিও ছিল বিশেষ ধরণের, যা উড্ডয়নের সময় কোন শব্দ করে না এবং যে অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্যবহার করেছিল সেগুলোও ছিল সাইলেন্সার। একারণে সামগ্রিকভাবে অপারেশনটি সম্পন্ন করা হয়েছিল নীরবতার মধ্য দিয়ে এবং তারা কারো সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য কোন সুযোগ রাখেনি। বাড়ির লোকজন ও এলাকার পার্শবর্তী লোকেরা একমাত্র যে আওয়াজ শুনেছে তা হল, বাড়ির ভেতর অপারেশন চলাকালীন সময়ে বা অপারেশনের শেষের দিকে একটি হামলাকারী হেলিকপ্টারের বিস্ফোরিত হওয়ার আওয়াজ। এবং সে আওয়াজটি স্বল্প সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

খালিদ যখন নীচতলায় অবতরণ করেছিল তখন আক্রমণকারীরা তাকে তৎক্ষনাতই ফায়ার করে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর তারা তিনতলায় আরোহণ করে তাতে প্রবেশ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাবার ওপর ফায়ার করে। ফলে তিনি জমিনে লুটিয়ে পড়েন। বিন লাদেন সে সময় কোন অস্ত্রও হাতে নিয়েছিলেন না। তার স্ত্রী ঘাতক সৈন্যের অস্ত্র আটকে ধরে রেখেছিলেন ও তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে তাকে আঘাত করে মাটিতে ছুড়ে মারে। অতঃপর তাঁর ওপর ফায়ার করে, গুলি তাঁর হাঁটুতে লেগেছিল এবং এখন পর্যন্ত তিনি সেই পা ঘুড়াতে পারেন না।

সৈন্যরা মহিলা ও শিশুদেরকে পিছন থেকে হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে একটি রুমে একত্রিত করে। অতঃপর তারা বাবার মৃতদেহ এনে তাদের পিছনে প্রলম্বিত করে রেখে দিয়ে তাদেরকে ঘুরে দেখতে নির্দেশ দিল ও তাদেরকে প্রশ্ন করল যে, "ইনি কে??" তারা সকলে এই বলে প্রতিউত্তর করলেন যে, "ইনি আল্লাহর বান্দা"। তারা তাদেরকে পূনরায় দেয়ালের দিকে ফিরার নির্দেশ দিল। অতপর তারা খালিদের মৃতদেহকে স্বস্থানে ফেলে রেখে বাবার মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল।

পাকিস্তানিরা এসে মহিলা ও শিশুদেরকে নিয়ে গেল। খালিদের মা চলে যাওয়ার আগে খালিদের মৃতদেহের প্রতি ঝুঁকে তার কপালে চুমু খেলেন... অতঃপর চলে গেলেন।

বাড়ির আঙ্গিনায় খানিকটা বর্ধিতাংশ ছিল। তাতে পাহারাদার তার বিবি-সন্তানের পরিবার নিয়ে বসবাস করতো। সেই রাত্রিতে তার একজন নিকটাত্মীয় মেহমান ছিল। সেই পাহারাদারই হলেন, আবু আহমাদ আল কুওয়াইতী। হামলাকারীরা তাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলেছে এবং পিছনে জীবিত কাউকে ছেড়ে যায়নি।

অতঃপর তারা তাদের অবশিষ্ট হেলিকপ্টার দিয়ে চলে গেল... এবং রক্ত ও মৃতের গন্ধে পরিপূর্ণ স্থান স্তব্ধ হয়ে গেল।